# ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ কথা

ডঃ সৌরেন বসু



আমাদের দেশের বালক - বালিকাদের অক্ষর বা বর্ণমালার পরিচয় ঘটতো পুঁথির মাধ্যমে। তারা পাঠ গ্রহণ করতো গু ব া পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে টোল, পাঠশালা, মাদ্রাসা ও মক্তবে । ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে শিক্ষাল াভের এই কেন্দ্রগুলির অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয়। গু ও পণ্ডিতমশাইদের পর থেকে শিক্ষালাভের এই কেন্দ্রগুলির অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয়। গু ও পণ্ডিতমশাইদের গ্রাসাচ্ছাদন করাও সেদিন দুরূহ হয়ে উঠেছে দেখা যায়। জমিদার বাড়ির ভৃত্য অথবা কোন ব্যবসায়ীর খাতা - সারার কাজে তাঁদের নিযুক্ত হতে হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ভৃত্য ঈশ্বরের ভূমিকা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্ণকারের দোকানে অতি সামান্য বেতনে কাজ করা -- এই দুইটি তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এখানে একথাটি উল্লেখ করার বিশেষভাবে প্রয়োজন এইজন্য যে ইংরেজরা আম াদের দেশে পাঠশালা বা বঙ্গবিদ্যালয় তৈরি করার জন্য যে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন তার পিছনে দুটি কারণ লক্ষণীয় -- ১ ) দেশীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলি প্রায় উঠেই গিয়েছিল, ২) এদেশে শাসনকার্য ভালোভাবে চালাতে হলে এদেশ থেকেই শিক্ষিত ইংরেজদের পিছনে বহু অর্থ ব্যয় করতে হবে। উপরন্তু ইংরেজ সিভিলিয়ানদেরও বাংলা ভাষা শেখার বিশেষ প্রয়োজন, না হলে শাসনকার্য ও ধর্মান্তকরণ দুটো কাজ সমানভাবে চালানো যাবে না। এজন্য ১৮১৩ সালেই এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছিল।

এখানে বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১২ বছর ৫ মাস ধরে কলকাতার বিখ্যাত সংস্কৃত কলেজে কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায় ও দর্শন বিভাগে জ্ঞানলাভ করেন। ১৮৪১ সালে ৪ঠা ডিসেম্বর‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি গ্রহণ করে ঈশ্বরচন্দ্র এখানকার পাঠ শেষ করেন। পাশ করেই ২৯শে ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলাবিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের চাকরীতে যোগ দেন। এরপর কিছুদিনের জন্য সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ হন। ১৮৫১ সালে ৫ই জানুয়ারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও অস্থায়ী সেক্রেটারি এবং ২২শে জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি দক্ষিণবঙ্গের স্কুল ইনস্পেকটরের পদেও কাজ করতেন। সাত বৎসর অধ্যক্ষের কাজ করে ১৮৫৮ সালের ৩রা নভেম্বর সংস্কৃত কলেজেঅধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন।

১৮৫১ সালের ২২ জানুয়ারী থেকে ১৮৫৮ সালের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত সময়কালেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট কাজগুলির সূচনা করেন। বন্ধুদের সহায়তায় এবং সাহেবদের সান্নিধ্যে ইংরেজি ভাষা বিশেষভাবে রপ্ত করেন। এইসময় নর্মাল স্কুল স্থাপন, নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরে মডেল স্কুল স্থাপন ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ রদ, সাহিত্য সাধনা এবং শিশুশিক্ষার জন্য ‘বর্ণপরিচয়’ পুস্তক রচনা করেন।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইংরেজরাই একটি শিক্ষাপরিষদ্ তৈরি করেছিলেন। এই শিক্ষা পরিষদের সম্প াদক মিঃ ময়েট এবং সভাপতি মি.ই. রেয়ন এবং কমিটির সদস্য ছিলেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, মি. মিলেট এবং প্রিন্সেপ সাদ ারল্যাণ্ড। বাংলার ছোটলাট ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে যিনি আগে শিক্ষাপরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেবিদ্যাসাগরকে একটি পরিকল্পনা করতে বলেন। বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিদ্যাসাগরের

সুচিন্তিত বক্তব্যে হ্যালিডে মুগ্ধহন। ইতিমধ্যে হার্ডিঞ্জের পরিকল্পনা অনুসারে ১০১ টি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত হয় কিন্তু এইসকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য ভালো পাঠ্যবই ছিল না। বিভিন্ন জেলায় স্কুল ইনস্পেকটরের কাজে ঘুরে ঘুরে বিদ্যাসাগর এটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। ১৮৫১ সালে ২৮শে জুন শিক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে ব াংলা ভাষায় নতুন পাঠ্যবই রচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই পরেই বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ এবং এবং জুম মাসে 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন।

ইতিপূর্বে প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য বইয়ের অভাবে পড়ানো হতো অন্নদামঙ্গল, হিতোপদেশ, জ্ঞানপ্রদীপ, পুষ পরীক্ষা অমরকে াষ, প্রবোধচন্দ্রিকা এবং পাঠকৌমুদী প্রভৃতি শিশুদের পক্ষে অনুপযোগী সব গ্রন্থ। এদেশ মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহারের সাথে সাথে ১৮১৬ থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে শিশুদের উপযোগী বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস লক্ষ্য করার মতো। এইসকল পাঠ্য বইগুলি ছাপানো হয়েছে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন, ক্যালক্যাটা স্কুল বুক সোসাইটি, হিন্দু কলেজ প্রভৃতি কেন্দ্র থেকে।

১৮১৬ -- লিপিধারা -- শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন।

১৮১৮ -- বর্ণমালা -- জেমস স্টুয়ার্ট, ক্যালক্যাটা স্কুল বুক সোসাইটি।

১৮২০ -- জ্ঞানাণোদয় -- রাধাকান্ত দেব।

১৮৩০ -- শিশুবোধক -- ঝিনাথ তর্কবাগীশ।

১৮৩৫ -- বঙ্গবর্ণমালা, শব্দসার -- ঈশ্বরচন্দ্র বসু।

১৮৪০ -- শিশুসেবধি (গ্রন্থমালা) -- রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

১৮৯ -- শিশুশিক্ষা (৫টি ভাগ) -- মদন মোহন তর্কলঙ্কার প্রথম ৩টি ভাগ রচনা করেছিলেন। ৪র্থ ভাগ (বোধোদয়) রচনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫১ সালে। ৫ম ভাগ (নীতিবোধ) রচনা করেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সকল পাঠ্যবইগুলির মধ্যে 'শিশুবোধক' 'শিশুসেবধি' এবং 'শিশু শিক্ষা' -- প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ বহুদিন শিশুদের মধ্যে বর্ণপরিচয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। বইগুলিতে একসঙ্গে বিবিধ বিষয় শিক্ষা দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয়, বানান, গণিত, ব্যাকরণ, চাণক্য শ্লোক, পৌরাণিক গল্প, ভূগোল, ইতিহাস, নীতিকথা এমনকি গঙ্গার স্তবেরও উল্লেখদেখা যায়। বিদ্যাসাগররের রচিত 'বর্ণপরিচয়' -- এর পরবর্তীকালে ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজপাঠ' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, সুখলতা রাও -এর নিজে পড়, নিজে শেখ শিশুপাঠ্য বই হিসেবে আকর্ষণীয় হয়।

কিন্তু 'বর্ণপরিচয়' রচিত হওয়ার দেড়শো বছর পরেও এই বইটি কেন আমরা বুকের মধ্যে আঁকড়ে রেখেছি, কেন তা অ াজও অম্লান হয়ে আছে - তা একটুখানি আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

একটি চাকচিক্যহীন পাতলা ফিনফিনে বইয়ের কাছে বাংলার বড় বড় পণ্ডিতেরাও ঋণী হয়ে আছেন। বাংলা শিখতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের ' 'বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পড়েন নি এমন লোক বড়ো একটা দেখা যায় না। ইদানীংকালে কেউ কেউ এই বইদুটিকে উপেক্ষা করতে গিয়ে পরবর্তীকালে শিক্ষিত হয়েও বাংলা বানান লিখতে গিয়ে লজ্জাহীনভাবে ভুল করে বসেন।

প্রথম ভাগটির কথাই ধরা যাক - মাত্র একান্ন পাতার একটি চটি বই। একুশটি পাঠে বিভক্ত। চিত্রগুলি সাদাকালো একেব ারেই সাদামাটা। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয়ের চিত্র ছাড়া একটি ঘড়ি ও একটি রেলগাড়ি এই দুটি ছবি আছে। রঙীন চিত্রহীন এই বইটির আকর্ষণ তাহলে কোথায়? একটু মনোযোগ দিয়ে আদ্যোপান্ত পড়লে সেটা বোঝা যায়।

১) প্রতিটি স্বরবর্ণ যুক্ত করে - অ-কার থেকে ঔ-কার পর্যন্ত বহু পরিচিত, এবং নিত্য ব্যবহৃত শব্দের উদাহরণ।

২) দুই অক্ষর, তিন অক্ষর, চারি অক্ষর ও পাঁচ অক্ষরের মিশ্র শব্দের উদাহরণ এবং খণ্ড ত, অনুস্বার, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু যুক্ত করে পৃথক শব্দ সম্ভার।

৩) প্রথম পাঠ থেকে সেই অপূর্ব শব্দযোজনা যেন কবিতার মতো। ছোট শিশুদের মুখে ছোট ছোট শব্দের মিষ্টি উদাহরণ- -- (ক) বড় গাছ। ভাল জল। লাল ফুল। ছোট পাতা (খ) পথ ছাড় জল খাও। হাত ধর। বাড়ী যাও। (গ) কথা কয়। জল পড়ে। মেঘ ডাকে। হাত নাড়ে। খেলা করে। এরপরে সেই তিন আর দুই অক্ষরের শব্দের খেলা -- নূতন ঘটি। পুরাণ বা

টি। কাল পাথর। সাদা কাপড়। শীতল জল (ঘ) অষ্টম পাঠে ত্রিযার সাথে পরিচয় করাতে সেই মুখরিত ধবনি -- কাক ডা কিতেছে। গ চরিতেছে। পাখী উড়িতেছে। জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে। ফল ঝুলিতেছে। (ঙ) দুই, তিন, চার এবং পাঁচ অক্ষরের ছন্দোময় উদাহরণ আমাদের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে 'বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী' রূপে দেখেছিলেন এই কারণেই। বালক বয়সে 'জল পড়ে পাত া নড়ে'র মধ্যে কবিতার প্রথম স্পর্শ অনুভব করেছেন। বাক্যগুলি 'সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত' করেছিলেন বলেই প্রথম ভাগের গোপাল ও রাখালের কাহিনী মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। প্রতিটি বাক্য ব্যবহার সৌম্য ও সরল শব্দ ব্যবহার এবং সেটিকে ছন্দোময় করে তোলার অপূর্ব দৃষ্টান্তই 'বর্ণপরিচয়'কে অমর করে রেখেছে।

একটি ক্ষুদ্রকায় পুস্তিকায় 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগে ৪৪৯টি শব্দের সম্ভার, সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থিত করার কি বিস্ময়কর নৈপুণ্য। বাংলাভাষার সচরাচর ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত শব্দ কয়েকটি পাতায় যেন ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র। যখন লেখেন -- অংশ, বংশ, হংস, মাংস কিংবা চাঁদ, ফাঁদ, বাঁশ, হাঁস অথবা কই, বই, মই, লই কিংবা দাদা, বাবা, মামা, রাজা অথবা চারি, পূজা, ধেনু, শিখা তখন পাতায় পাতায় কবিতা লেখা হয়ে যায়।

এবারে 'বর্ণপরিচয়' এর মূল বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করি। সেটি শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা বৈশাখ, সংবৎ ১৯১২তে বর্ণপরিচয়ের বিজ্ঞ াপনে উল্লেখ করেছেন -- বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকাল অবধি বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, দীর্ঘ ঋকার ও দীর্ঘ ঌ কারের প্রয়োগ নাই। এই নিমিত্ত, ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এজন্য, ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থা কিলে ড, ঢ, য় হয়; ইহারা অভিন্নবর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচচারণ উভয়ই পরস্পর ভেদ আছে, তখন ইহারা স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হওয়া উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ, সুতরাং উহা সংযুক্তবর্ণ; এজন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের গণানাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।' ত াহলেই দেখা যায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম স্বরবর্ণ ষোলোর স্থানে, বারো ব্যঞ্জনবর্ণ চৌত্রিশের স্থলে, চল্লিশ হিসাবে গণনা করছেন।

আবার কুড়ি বছর পরে আরও একটি সংস্কার লক্ষণীয় যা ১লা পৌষ সংবৎ ১৯৩২-এ লেখা বিজ্ঞাপনে আছে --- 'অ াবশ্যক বোধ হওয়াতে এই সংস্করণে, কোনও কোনও অংশ পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সেই অংশে, পূর্বতন সংস্করণের সহিত, অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে।

প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বালকেরা অ, আ, এই দুই বর্ণকে স্বরের অ, স্বরের আ, বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা সের ূপ না বলিয়া কেবল অ, আ এইরূপ বলে তদ্রুপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

যে সকল শব্দের অন্ত্য বর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হসন্ত, কতকগুলি অকারান্ত উচচারিত হইয়া থাকে। যথা -- খল, গজ, জল, পথ, রস, বন ইত্যাদি; অকারান্ত -- ছোট, বড়, ভাল, ঘৃত, তৃণ, মুখ ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ না করিয়া, তাদৃশ শব্দ মাত্রেই আকার ান্ত উচচারিত হইয়া থাকে। বর্ণযোজনার উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি আকারান্ত উচচা রিত হয়, উহাদের পার্শ্বদেশ * এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইল। যে সকল শব্দের পার্শ্বদেশে তদ্রুপ চিহ্ন নাই, উহারা হলন্ত উচচা রিত হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় তকারের ত, ৎ, দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড তকার। ঈষৎ, জগৎ, মহৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময় খণ্ড তকার, ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ড তকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষভাগে তকারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।'

শিশু শিক্ষার জন্য কী গভীর চিন্তা ভাবনা করতেন ঈশ্বরচন্দ্র; তা এই কুড়ি বছর পরেও তাঁর সংস্কারকের ভূমিকা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। বর্ণপরিচয় করতে যে সকল পশুপাখি ফলের ব্যবহার আছে, সেগুলির সাথে শিশুদের নিত্য পরিচয়।

প্রথমভাগে ২১ পাঠে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার উল্লেখ শিশুদের মনে প্রথমেই গণনা করার প্রবণতাকে জাগিয়ে দেয়। এখানে গোপাল ও রাখালের নিত্যদিনের কাহিনীকে উপস্থিত করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র। কোথাও কোন কল্পলোকের আশ্রয় নেন নি।

‘বর্ণপরিচয়’ দ্বিতীয় ভাগ। এখানে ৪৮১টি যুক্তবর্ণ ব্যবহার করে শব্দগুলি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে উপস্থিত করা হয়েছে। এমনকি দুই ও তিন অক্ষরে মিশ্র সংযোগের এতগুলি শব্দের উদাহরণ সন্নিবেশিত করা বড় সহজ কাজ নয়। কাশী, কলিকাতা জাতীয় পাঠাগার, হাওড়ার পোল, তাজমহল ও বিদ্যাসাগরের বাড়ী -- এই পাঁচটি মাত্র ছবি।

এখানে যুক্তবর্ণের শব্দ ব্যবহার করে ১০ টি পাঠে অত্যন্ত সহজ সরল গদ্যে পরিবেশিত হয়েছে -- ‘সদা সত্য কথা বলিব’ ‘শ্রম না করিলে, লেখাপড়া হয় না’ ‘যখন পড়িতে বসিবে, অন্যদিকে মন দিবে না’ ‘না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়’ প্রভৃতি উপদেশমূলক বাক্যগুলি শিশুমনের নির্মল পাতায় বিশেষভাবে দাগ কেটে যায়।

এছাড়া যাবদ, মাধব, নবীন, রাম, সুরেন্দ্র প্রভৃতি বালকগুলির কথা ও কাহিনী, এবং ১০ম পাঠে ভুবন ও তার মাসীর গল্প সত্যই চিত্তাকর্ষক। ‘নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকট মুখ লইয়া গেল, এবং জোরে কামড়াইয়া দাঁত দিয়া একটি কান কাটিয়া লইল।’ --- এইখানেই হঠাৎ কাহিনীর এই মোড় ঘুরে যাওয়ায় একটি আকর্ষণীয় ছোটগল্পের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে কোনও কল্পিত বা অবাস্তব বিষয় নিয়ে একটি বাক্যও রচিত হয়নি। কোনও কুসংস্কার এখানে স্থান পায়নি। কোনও দেব - দেবীর স্ত্রোত্র বা স্তব জুড়ে দিয়ে ধর্মমোহ সৃষ্টি করতে চান নি।

বিস্মিত করে ধ্বনিনির্ভর সহজ, সাবলীল ও অনায়াস শব্দচয়নের দক্ষতা; যখন লেখা হয় --- অদ্য, বাদ্য, বিদ্যা, বিদ্যুৎ অথবা অন্য, ধন্য, শূন্য কিংবা ভগ্ন, মগ্ন, অগ্নি, আগ্নেয় অথবা রক্ত, শক্ত, বক্তা, ভক্তি। এমনই অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যা পড়বার পরেও হৃদয় তন্ত্রীতে অনুরণিত হয়।

বর্ণ, শব্দ, বাক্য, উচ্চারণ, শব্দব্যবহার, সহজ - সরল ভাষায় শিশুবোধ্য, শিশুপাঠ্য বাক্যগঠন, সর্বোপরি সকল প্রকার মানসিক উন্নয়নের কাহিনী পরিবেশ বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’কে এক চিরন্তন প্রাথমিক শিক্ষার বই হিসেবে পরিগণিত করেছে।



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com